কালের কণ্ঠ

তারিখ: 23 JAN 2017
পৃষ্ঠা: ...

রিফাত আফরোজ ▷

সাক্ষরতার হার বাড়াতে যা করণীয়

আমাদের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বেশির ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকে। এখন স্কুলে সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িক, সমাপনীসহ বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার চলন হয়েছে। সুতরাং আলাদা করে পড়ার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোনো ক্লাস বা পাঠ নেওয়াটা কষ্টকর। পাশাপাশি দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষে বিশেষ কোনো মনোযোগ বা কার্যক্রম চোখে পড়ে না। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে সাধারণত তিন ধরনের সমস্যায় পড়ে, অভিভাবকরা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হলে পড়াশোনার গুরুত্ব তাঁরা কম বোঝেন অথবা বোঝেন না। অনেকের আবার প্রতিনিয়ত বই কিনে দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই

সাক্ষরতা যাচাই করার জন্য সাধারণত লিখতে ও পড়তে পারার পাশাপাশি কিছু সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা শিক্ষা (প্রথমে মাতৃভাষা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজি) ভীষণ গুরুত্ব পায়। কেননা যেকোনো রকমের যোগাযোগের জন্য ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষণের বিষয়। শুদ্ধভাবে লিখতে ও পড়তে পারা যেকোনো ভাষা শেখার প্রধান শর্ত। শিশুদের ক্ষেত্রে ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে ও পড়তে জানা খুবই জরুরি।

কয়েক বছর ধরে প্রাথমিকের সব শিক্ষার্থীকে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। এই পরীক্ষায় পাসের হার অত্যন্ত উচ্চ হওয়ায় এটা অনুমান করা যায় যে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। যার মধ্যে সঠিকভাবে পাঠ্যপুস্তক বা সমমানের বই শ্রবণযোগ্য স্বরে পড়তে পারা, যুক্তবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও ক্রমবাচক শব্দ সঠিকভাবে পড়তে পারা অন্তর্ভুক্ত। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থী বিরামচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ শিখেছে বলে আশা করা যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে তাকে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখার দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।

গত বছরের শেষের দিকে দেশের উত্তরাঞ্চলের দুটি উপজেলায় ৩০টি নমুনাকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি জরিপ চালানো হয়। এ জরিপে তৃতীয় শ্রেণির মোট ৬০০ শিশুর ওপর ৪০ মিনিটের একটি অভীক্ষা পরিচালনা করা হয়, যেখানে সেই শ্রেণির বই থেকে দুটি অনুচ্ছেদ (দৈর্ঘ্যে কিছুটা ছোট করে) ব্যবহার করা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদ দুটির সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিল। সে জন্য আশা করা হয়েছিল যে তারা দ্রুত ও সঠিকভাবে পড়তে পারবে। সঠিকভাবে মান যাচাই করার জন্য শিক্ষার্থীরা যা পড়েছে তা পুরোটাই রেকর্ড করা হয়েছিল এবং পরে প্রতিটি রেকর্ডিং বারবার শুনে, প্রতিটি শব্দ ধরে বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে একটি গবেষণা করা হয়। এ গবেষণায় দেখা যায়, একটি উপজেলায় প্রায় এক দশমাংশ এবং আরেকটি উপজেলায় তার দ্বিগুণ শিক্ষার্থী কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি। যারা কিছুটা চেষ্টা করেছে তাদের তিন ধরনের আচরণ করতে দেখা গেছে। প্রথম গ্রুপ, যেসব শব্দ অপরিচিত, সেগুলো প্রথমে বর্ণাকারে উচ্চারণ করে পড়েছে, পরে শব্দাকারে পড়ার চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয় গ্রুপ, একটু অদ্ভুত আচরণ করেছে। ধরা যাক, অনুচ্ছেদে একটি শব্দ 'ই' দিয়ে শুরু হয়েছে, যেটি একজন শিক্ষার্থীর কাছে অপরিচিত, সে তখন 'ই' দিয়ে তার জানা কোনো একটি শব্দ উচ্চারণ করে পরের শব্দে চলে যাচ্ছে। তার মানে, শিক্ষার্থী যেসব শব্দ পড়তে পারছে না তারা সেগুলো অনুমান করে উচ্চারণ করছে এবং অনুচ্ছেদের অবশিষ্ট অংশও একইভাবে পড়ার চেষ্টা করছে। যে যত শব্দ অনুমান করে পড়ছে, তার পড়াটা তত অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় গ্রুপ, একদম প্রথম থেকে নিজের মনের মতো করে যা মনে এসেছে তা-ই পড়েছে, অনুচ্ছেদটির সঙ্গে যার কোনো রকমের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক মোটামুটিভাবে দুটি অনুচ্ছেদই সাবলীলভাবে পড়তে পেরেছে। ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী যুক্তবর্ণ এবং বড় শব্দ (চার বা ততোধিক বর্ণের) উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে খুব একটা সফল হয়নি। এ ছাড়া ৮০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী বিরামচিহ্ন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উদাসীন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সব পরীক্ষায় (আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক) মেয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়। এই গবেষণায়ও একই ধরনের ফলাফল লক্ষ করা যায়। মানব উন্নয়ন সূচকের (এইচডিআই) সঙ্গে সাক্ষরতার একটি সরাসরি সংযোগ রয়েছে। এই দক্ষতা দ্বারা আমরা পড়তে ও লিখতে এবং সংখ্যা গণনার ধারণা পাই। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাক্রম প্রচলিত আছে, তা ভাষা শেখার জন্য যথেষ্ট বলে শিক্ষাবিদরা মনে করেন। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত যে শিক্ষার্থীকে পঠন দক্ষতা অর্জন করতে হলে তিনটি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যেকোনো শব্দ পড়তে জানতে হবে, কোনো অনুচ্ছেদ পড়ে তার শব্দার্থ বুঝতে হবে এবং শব্দভাণ্ডার বাড়াতে হবে।

এটি আসলে খুব সহজে অনুধাবন করা সম্ভব যে মানসম্মত শিক্ষার জন্য মানসম্মত শিক্ষকও দরকার। সরকারিভাবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর এখন আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বেতনাদি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তার সুফল পেতে হলে ভালো পরিকল্পনা, উপযুক্ত বই, সঠিক কৌশল বিশেষ করে প্রতিটি স্তরে একটি সুসংগত পড়া কর্মসূচি বাস্তবায়িত করাও ভীষণ জরুরি। এ কথাও ঠিক, যথাযথ শিক্ষার অংশ হিসেবে যথাযথ পরিকল্পনা ও উপযুক্ত বই নির্বাচন করা জরুরি। এর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ও বাসায় 'রিডিং কালচার' তৈরি করাটাও ভীষণ জরুরি।

আমাদের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বেশির ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকে। এখন স্কুলে সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িক, সমাপনীসহ বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার চলন হয়েছে। সুতরাং আলাদা করে পড়ার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোনো ক্লাস বা পাঠ নেওয়াটা কষ্টকর। পাশাপাশি দুর্বল শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণিকক্ষে বিশেষ কোনো মনোযোগ বা কার্যক্রম চোখে পড়ে না। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে সাধারণত তিন ধরনের সমস্যায় পড়ে, অভিভাবকরা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হলে পড়াশোনার গুরুত্ব তাঁরা কম বোঝেন অথবা বোঝেন না। অনেকের আবার প্রতিনিয়ত বই কিনে দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই এবং অনেকের মধ্যে সচেতনতার অভাবও দেখা যায়। এ ছাড়া গ্রামীণ এলাকায় শিশুদের উপযোগী বই অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায় এবং লাইব্রেরিরও স্বল্পতা রয়েছে। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'রিডিং কালচার' তৈরি করা সহজ নয়। তবে স্কুলও কমিউনিটির এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন জায়গায় লাইব্রেরি স্থাপন বা বইপড়ার কর্মসূচি চালু রয়েছে। এতে স্কুল এবং কমিউনিটির যৌথ প্রচেষ্টা থাকতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে অনেক সময় ও প্রচেষ্টার ব্যয় করতে হবে। ঝরে পড়ার পাশাপাশি দুর্বল শিক্ষার্থীকে বেশি সময় দিতে হবে এবং বেশি বেশি করে পড়া ধরতে হবে। পড়ার সাবলীলতা ও উপযুক্ত বিরতি ব্যবহার করাও গুরুত্বপূর্ণ। পড়ার উপকরণ ও নিয়মিত পড়ার অভ্যাস বিভিন্ন জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার্থী ও তার পরিবারের সদস্যদেরও তাড়না অনুভব করা উচিত। ক্রমাগত অনুশীলন স্কুলে ও বাড়িতে তাদের নিজেদের পঠন দক্ষতার ওপর আস্থা বাড়িয়ে তুলবে। শিক্ষকদের জন্য পড়ার সংস্কৃতি তৈরি এবং শিক্ষার্থীর নিয়মিত মূল্যায়ন ও অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। এর মানে হলো, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের আরো করিতকর্মা হতে হবে। প্রধান শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বিফলতার জন্য দায়ী হতে হবে। মা-বাবা এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশীদার হতে পারে। তাঁরা তাঁদের শিশুদের শেখার আপডেট তথ্য পেতে পারেন, তাঁরা আরো সক্রিয় হতে পারেন। শিক্ষকদের পেশাদার প্রশিক্ষণ চাহিদা চিহ্নিত করা উচিত। নিয়মিত ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। নিয়মিত ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও তার প্রয়োগ বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে (পিটিআই) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

লেখক : বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত